মোড়

কথাটা সুরতিয়াই প্রথম বলেছিল।

উঠোনের এক পাশে উবু হয়ে বসে তোলা উনুনের ছাই কাড়তে কাড়তে বললো, "জানো মাইজী, ওই মোড়ের কাছে চন্দুলালের চায়ের দোকানটা যেখানে, ওইখানে কোত্থেকে একটা পাগলি এসেছে। সোন্দর ফুটফুটে জোয়ান বয়সের একটা ভর পোয়াতি মেয়ে।"

চন্দুলালের বউ মুন্নিদেবী যে সেইক্ষণে শোবার ঘরের মেঝের উপর জাঁকিয়ে বসে মাসিমার ব্লাউজের বোতাম টেঁকে দিচ্ছে সে খবর জানতো না সুরতিয়া। জানলে সে মুখ খুলতো না মোটেই।

এ তল্লাটে মুন্নিদেবীর ভারি দাপট। শুধু ঝি চাকররাই নয়, মাইজিরাও একটু বুঝে সামলে চলে মুন্নিদেবীকে। যদিও আরও পাঁচটা ঝি-চাকরের মত সেও নগদ পয়সার বদলেই এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে দেয়, তাদের প্রয়োজন এবং তার সময় ও মর্জি মত। হয়তো তারতম্যটা সেখানেই। অন্যদের মত পয়সা রোজগারের গরজ নেই তার, নিজের রোজগারের পয়সার মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হয় না তাকে। ছেলেপুলের ঝক্কিঝামেলা নেই। চন্দুলাল চা বেচে যা মুনাফা করে তাতে পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি আরামে দিন কাটাতে পারে মুন্নিদেবী। এ বাড়ি সে বাড়ি ছুটকো কাজ করে বেড়ানোটা তার শৌখীন শখ বলা যেতে পারে।

দোকানের লাগোয়া ঘরখানায় শুয়ে বসে দিন কাটতে চায় না যখন, রঙ-চঙে বাহারে শাড়ি পরে তেল চুকচুকে চুলে ট্যাশেল্ জুড়ে লম্বা বিনুনি ঝুলিয়ে গালে দু'খিলি পান ঠুসে চটিতে পা গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। চলে আসে কলোনির মাইজিদের কাছে। কারো মাসান্তের ভাঁড়ার গুছিয়ে দিয়ে আসে, আবার কোন বাড়ির মাইজির প্রয়োজন মত

ছাদ ভর্তি গুল কিংবা চাদর ভরে বড়ি দিয়ে দেয়। কৃতজ্ঞ মাইজিরা পাওনা কড়ির উপর জল খাবার গুঁজে দেয় হাতে, চায়ের কাপ নিয়ে সাধাসাধি করে এবং আরও অনেক রকম আদিখ্যেতা করে, যার ছিটেফোঁটাও তাদের বাঁধা মাইনের ঝি চাকরের কপালে জোটে না, হাড়-মাস কালি করে নিত্যি খেটে মরা সত্ত্বেও। তবে মুন্নিদেবীর কদর যে তার আর্থিক সচ্ছলতার কারণেই সে কথাও বলা চলে না, কারণ তার স্বামী চন্দুলালও আর সবার মতই তাকে সমীহ করে চলে। ওজন রেখে কথা বলে তার সঙ্গে।

আসলে মুন্নিদেবী মানুষটাই ভারি রাশভারী। তার চেহারাই শুধু নয়, বলন-চলন-ব্যক্তিত্বই এমন যে কেউই তাকে হাল্কা ভাবে নিতে পারে না। পাশের ঘরে মুন্নিদেবীর উপস্থিতির কথা জানলে সুরতিয়া অমন হালকা গলায় পাগলি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতো না। কাজেই মুন্নিদেবী যখন দরজার কাছে সরে এসে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো, "তোকে কে বললো যে মেয়েটা পাগল?" সুরতিয়া চমকে থমকে ঢোক গিলে উনোন থেকে সদ্য বার করা ছাইয়ের গাদায় মনোনিবেশ করলো। কিন্তু আমাদের কৌতুহল জেগে গিয়েছে ততক্ষণে।

মাসিমা কড়াইয়ের ছ্যাঁক-ছ্যোঁক থামিয়ে বললেন, "কি ব্যাপার বল তো?"

বললাম, "কে জানে, আমি তো শুনিনি কিছু। কোথায় একটা মেয়ে এসেছে বলছে। "

"তা সঙ্গে কেউ নেই?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুরতিয়া ও মুন্নিদেবীর দিকে চাইলাম। সুরতিয়া পরম উদাসীন মুখে বাসনের পাঁজা নিয়ে মাজতে লেগেছে তখন।

মুন্নিদেবী দাঁত দিয়ে সুতো কেটে থমথমে গলায় বললো, "এখন আর তার সঙ্গে কেউ নেই। আগে ছিল নিশ্চয়ই, তা নইলে অমন দশা হবে কেন। যে ছিল সে কাজ সেরে নিয়ে কেটে পড়েছে। বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে বেচারার।"

"কোথাকার মেয়ে ও? এখানেই বা এলো কি করে? কবে এসেছে? আমরা তো জানিনে কিছু !"

মাসিমার কথা শুনে মুন্নিদেবী সেলাই থামিয়ে তাঁর দিকে চাইলো।

নির্দয় কন্ঠে বললো, "এসেছে অনেক দিন, তবে লুকিয়ে থাকে বলে দেখতে পাও নি তোমরা। ওই পোড়া মুখ দেখিয়ে বেড়াবে নাকি রাজ্যিসুদ্ধু লোককে? নাকি ঢাক ঢোল পিটিয়ে পিতৃপুরুষের নাম ধাম ঠিকানা রাষ্ট্র করে আরও কলঙ্ক ছিটোবে বংশের গায়ে? ট্রাকে না বাসে বসিয়ে কেউ ছেড়ে দিয়ে গেছে এখানে। খুন যে করেনি সেটাই আশ্চর্য। সাধারণত তাই তো করে শয়তানগুলো। তাদের দুষ্কৃতির সাক্ষী প্রমাণ কিছুই আর থাকে না তাহলে। সাবধানের মার নেই তো! তা এ হতভাগীর বেলায় সেটা করেনি। মানে না বাঁচুক প্রাণে বেঁচেছে অন্তত।"

বললাম, "কিন্তু সে আর ক'দিন? তরাইয়ের প্রচণ্ড শীতে ক'দিন বাঁচবে এই অবস্থায়, একটা আস্তানা না পেলে? এখন কোথায় থাকে? খাবারই বা দেয় কে?"

"থাকে গাছতলায়। লোকজন দেখলে আড়ালে আবডালে সরে যায়। আবার তেমন দেখলে এগিয়ে এসে হাতও পাতে। সেদিন চন্দুলাল খদ্দেরের পাতের ছোলে বটুরে দিতে গেলে বলে কিনা পাতের এঁটো খাবো না, আমাকে আলাদা এনে দাও। ওমা মিনসে তাই দিতে যাচ্ছিল, আমি গিয়ে হাত চেপে ধরলাম। কারবারি মানুষের কখনো দান-খয়রাৎ পোষায়! চায়ের দোকান লাটে উঠে যাবে তাহলে। মেয়েটাও সেয়ানা কম নয়।"

সাহানা স্নান সেরে চুল মুছতে মুছতে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। মুন্নিদেবীর সেলাই সারা হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে।

সাহানার হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে ওর চুলের গোছা জড়িয়ে নিঙড়ে দিতে দিতে বললো, "বাজার থেকে একখানা গামছা আনাও দিকি। এই এত চুল কি তোয়ালে দিয়ে সামলানো যায়? গামছা দিয়ে কষে বেঁধে খোঁপা করবে। দেখবে দু'মিনিটে সব জল টেনে নিয়েছে। তারপর রোদ্দুরে বসে বিলি কেটে চুল শুকোবে। ওই সব কেনা শ্যাম্পু কক্ষনো দিতে নেই চুলে। রিঠে দিয়ে চুল ধোবে। রিঠে আর আমলকি। চুলের জলুস বজায় থাকবে চিরদিন।"

সাহানা আমার দিকে চেয়ে মিট্ মিট্ করে হেসে বললো, "ও রমাদি, কি বলছে শোনো। তা এ সব ওকে শেখাতে পারো না মুন্নিদেবী? ওই দ্যাখো রমাদির বড়ির মত খোঁপা, কপালের দু'পাশে গড়ের মাঠ ----।"

মুন্নিদেবী উত্তর দিলো, "না।"

আমি হেসে বললাম, "আমায় বলে আর লাভ কি? আমি তো আর তোমার মত সুন্দর দেখতে নই ! আমায় পাকা দেখাও দেখতে আসছে না কেউ।"

সাহানা গাঢ় স্বরে বললো, "সে তো তোমারই দোষ রমাদি। এক সময় কিছু কম সুন্দর ছিলে না তুমি। এখনও অ্যালবামে সে সব ফটো রয়েছে। কি যে লেখাপড়ার বাতিক ঢুকলো মাথায়। তাও সাধারণ বি.এ. এম.এ. হলে কথা ছিল। ডাক্তারী ! এম.বি.বি.এস. পাশ করে মন ভরলো না। পাড়ি দিলে বিদেশে। এত খেটে খুটে, অহর্নিশি অক্লান্ত সাধনা করে লাভ হল চুপসে যাওয়া গাল, চোখের কোণে কালি, পুরু চশমা আর অকালে বুড়িয়ে যাওয়া চেহারা। আর লাভ হল ক'খানা ডিগ্রী যা শুধু জীবনভোর খেটে খাওয়ার পরোয়ানা ----।"

"কেন, পরোয়ানা হতে যাবে কেন?"

"বা রে, এই এত বছর ধরে পড়াশোনা, এত কষ্টার্জিত ডিগ্রী কি নষ্ট হতে দিতে পারো? ইচ্ছে করুক না করুক, ভাল লাগুক না লাগুক, আর তোমার নিষ্কৃতি নেই। নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছ, শুরুতেই ওই অত প্রতিভা দেখিয়ে।"

আমি টিপ্পনী কাটলাম, "তাই বুঝি ক্লাশ টুয়েলভের পরীক্ষাতেই ঝুলে গেলি তুই? যাতে তাজা ঝকঝকে চেহারা আর জ্বলজ্বলে স্বাস্থ্য নিয়ে বিলেত ফেরত ডাক্তার বরের কাঁধে চড়ে নির্ঝঞ্ঝাটে সংসার সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারিস? গায়ে রোদ জল ঝড়ের ঝাপ্টাটুকু না লাগে?"

মাসিমা বললেন, "সত্যি রে রমা। মেয়ের কি যে বিয়ের ভূত মাথায় ঢুকেছে। অত করে বললুম যে অন্তত গ্রাজুয়েট হয়ে নে আগে। আজকালকার দিনে বি.এ. পাশ না করলে মান থাকে? লেখাপড়ায় এমন কিছু খারাপ ছিল না আগে। ইদানীং একেবারে বইয়ের ধারে কাছেই ঘেঁসতে চায় না। এর আগে তো ভালই রেজাল্ট করে এসেছে বরাবর।"

সাহানা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললো, "রমাদিকে দেখে শিক্ষা হয়েছে আমার। পরীক্ষার কি শেষ আছে? একবার ভাল করা মানেই মেয়াদ বাড়লো। ওই অভিমন্যুর ব্যুহে ফাঁসতে চাই না আমি। তার চেয়ে বাবা প্রথম কোপেই কুপোকাত হয়ে গেলাম। ব্যস। পড়াশোনার হাত থেকে মুক্তি।"

মাসিমা চিন্তিত গলায় বললেন, "এখন থেকে মুক্তি মুক্তি করে নেচো না। ওরা কনে দেখে পছন্দ করুক, পাকা কথা হোক। সুভালাভালি বিয়েটা চুকে বুকে যাক আগে। অমন ভাল চাকুরে ছেলে, শুধু রমার চেষ্টাতেই যোগাযোগ হল। বয়েসটা একটু বেশী, তা সবদিক দেখতে গেলে চলে না।"

মুন্নিদেবী বললো, "দেবীমাতাকে মানৎ করে রেখো মাইজি। এ বিয়ে হবেই। আর এমন দুর্গা প্রতিমার মত রূপ। কনে অপছন্দ করুক দেখি।"

মাসিমা ডান হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "সে তো করেইছি। মেয়ে পছন্দ হলেই তোর সঙ্গে গিয়ে পুজো দিয়ে আসবো'খন ----।"

মাসিমার চিন্তিত হবার কোন কারণ ছিল না। অষ্টাদশী সাহানার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ ডক্টর বিকাশ দত্ত কেবলমাত্র তার বত্রিশ বছর কালের আইবুড়োত্ব খণ্ডাতেই সম্মত হলেন না, এ ব্যাপারে এতই অধৈর্য হয়ে উঠলেন যে পাত্রপক্ষের ধার্য শুভদিনের মধ্যে বিবাহের তোড়জোড় কি ভাবে যে সম্পন্ন হবে সে চিন্তাতেই নতুন করে আকুল হয়ে উঠলেন মাসিমা। সর্ব সাকুল্যে কুড়িটি দিন হাতে। এরই মধ্যে কোলকাতায় ফিরে গিয়ে গয়নাগাটি ফার্নিচার বিছানাপত্র বানানো, জামা কাপড় কেনা কাটা - নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো, আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রণ, তাদের থাকা খাওয়া এবং বরযাত্রীদের সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা, হাজার রকম কাজ থাকে বিয়েতে। রক্ষের মধ্যে বিয়েটা হবে কোলকাতায়। কড়ি ফেললে তৈরী মাল জোগাড় হতে সময় লাগে না সেখানে। এবং মাসিমাদের আত্মীয় বন্ধু অধিকাংশেরই নিবাস কোলকাতাতেই। তাদের সাহায্য এবং পরামর্শ পেতে পারবেন ইচ্ছেমত এবং অনায়াসে।

কোলকাতা যাবার আগে দেবীমাতার মন্দিরে পুজোটা দিয়ে যাবেন মাসিমা। মানসিক পুজো। অযথা ঝুলিয়ে রাখতে চান না। তাছাড়া এদিকে আবার কবে আসেন না আসেন। নেহাত পাত্রের খোঁজেই এসেছিলেন এতদূর। কন্যাদায় বড় দায়। দায় খালাস হয়ে আবার কেন পাড়ি দিতে যাবেন মিছিমিছি।

শুক্রবার বিকেলে রওনা হওয়া গেল। মাসিমা, সাহানা, আমি আর

সুরতিয়া। গোড়াতে সুরতিয়ার যাবার কথা ছিল না। কথা ছিল মুন্নিদেবী যাবে। কিন্তু সেদিনের পর মুন্নিদেবীর আর দেখা নেই। বার কয়েক ডেকে পাঠিয়েও কোন লাভ হয়নি। সুরতিয়াকে দিয়েই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ইদানীং সুরতিয়া আর ডাকতে যেতে চায় না। অথচ মুন্নিদেবীর ব্যাপারটাও ভাঙতে চায় না খোলসা করে। ভাসা ভাসা এটুকু বুঝলাম যে মুন্নিদেবীর মন মেজাজ ভাল নেই, সাংসারিক অশান্তিতে আছে সে। এমত অবস্থায় দেবীমাতার পুজো দিতে যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। আমরাও গত ক'দিন - দশ বারো কি পনেরো দিন - একটু ব্যস্ত ছিলাম। মেয়ে দেখানোর পর্ব ছাড়াও আমার সকাল বিকেল ডিউটি, মাসিমার মানসিক উত্তেজনা। সাহানারও তাই। শেষ অবধি মুন্নিদেবীর বিকল্পে সুরতিয়াকে নিয়েই যাত্রা শুরু হল।

মাইল আষ্টেক বাসে গিয়ে তারপর আরও মাইল খানেক খাড়া পাহাড়ি রাস্তায় সন্তর্পণে আরোহন - প্রতি পদে পতন ও অঙ্গ হানির ভয় তুচ্ছ করে। পাহাড়ের চূড়োদেশে দেবীমাতার মন্দির ও তৎসংলগ্ন চটি। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। হয়তো সেইজন্যই এই চটিতে ভক্তদের আয়েসের স্বল্পাদপি ব্যবস্থা নেই কোন রকমের। থাকবার মধ্যে টিনের শেডের তলায় ছারপোকা অধ্যুষিত গোটা দশেক দড়ির খাটিয়া। সে রাতটা ঠায় বসে কাটিয়ে দিলাম আমরা। রাত্রিশেষে দেবীমাতার পূজার্চনা সেরে আবার সেই পথে প্রত্যাবর্তন। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে দুরু দুরু বক্ষে অতি সন্তর্পণে অবরোহন। পাহাড়ের নীচে নামলেই বাস স্টপ। বাসে চড়ে সিধে বাড়ি অবধি চলে আসা যায় কারণ বাড়িটা বাস স্টপের পাশেই। কিন্তু বিধি বাদ সাধলো।

বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে বাস গেল বিগড়ে। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার, ক্লীনার তিনে মিলে নানা কায়দা কসরৎ করলো অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু তাদের সমবেত চেষ্টায় কোন ফল হল না। এদিকে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এমনিতেই জায়গাটা ফাঁকা। রাত গভীর হলে পায়ে হেঁটে যাওয়া সমীচীন হবে না। বিশেষতঃ চারজনই মহিলা আমাদের দলে। বাসের ভরসায় না থেকে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে নেমে পড়লাম। এখান থেকে বাড়ি খুব একটা দূর নয়। পুরো এক মাইলও নয় হয়তো। অন্য সময় হলে গায়ে লাগতো না, কিন্তু পাহাড়ে ওঠা এবং নামার ধকল ও রাত্রি জাগরণের পর মালপত্র বয়ে হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মালপত্র মানে দুটো কিট ব্যাগ, একটা ছোট ঝুড়ি ও একটা পুঁটলি। সামান্য

জামাকাপড় সাবান তোয়ালে টুথ ব্রাশ ও পুজোর উপকরণ প্রসাদ-টসাদ এই আর কি। হাতে হাতে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম সকলে। মাসিমার হাতে পুঁটলি, সুরতিয়ার হাতে ঝুড়ি, আমার ও সাহানার হাতে ব্যাগ। কোনমতে পা টেনে টেনে এগুচ্ছিলাম আমরা। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। কতক্ষণ পরে রাস্তার মোড়ের কাছে পৌঁছলাম।

চন্দুলালের চায়ের দোকানের ঝাঁপি বন্ধ। দোকানের সামনে রাস্তার উপর একটি স্ত্রীলোক হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রয়েছে। আধো অন্ধকারে নির্জন পথে কেমন যেন ভূতুড়ে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে তাকে। আমরা থামলাম।

মাসিমা ফিস ফিস করে বললেন, "হ্যাঁ রে, এই রাত্তির বেলায় রাস্তার উপর মেয়েমানুষ বসে কেন? কে ও?"

সাহানা বললো, "সেই পাগলিটা নয় তো?"

মনে পড়লো আমাদের। চন্দুলালের চায়ের দোকানের কাছেই তো পাগলিটা ঘুর ঘুর করে শুনেছি। চন্দুলালের বউ অবশ্য বলেছিল মোটেই পাগল নয়, ভারি সেয়ানা মেয়ে। সে যাই হোক এই মেয়েটাই নিশ্চয়। যাওয়ার সময় বাড়ির দোরগোড়া থেকেই বাস ধরেছিলাম। তখন চোখে পড়েনি তাই। মেয়েলোকটা সাড়া পেয়ে মাথা তুললো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এলো।

সুরতিয়া মাসিমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে চাপা গলায় বললো, "য়ঁহা রুকেকে কাম নইখে মাইজি। জলদি চলি।"

মাসিমার হাত ধরে হন হন করে এগিয়ে গেল সুরতিয়া। আর ওর দেখাদেখি আমি আর সাহানাও ছুট লাগালাম মেয়েলোকটার পাশ কাটিয়ে।

পিছন থেকে তার বিলাপ শুনতে পেলাম, "হে ভগবান। তু ওকরাকে মৎ চৈনসে জীয়ে দিহ। আপনা মেহরারুকে ছোড়কে বদমাস অব দুসরা লড়কি পকড়ল। জিন্দগী ভর ইতনা সেওয়া কইলি ওকর য়হ ফল মিল্‌ল্‌ ----। বদমাস কে হাথ্‌ পাঁও সড়্‌ যাই, সারা বদন মে পিলু পড়্‌ যাই, গলি কে কুত্তা জিতে জী ওকরা মাস নোচ নোচ কে খাই না তো হামার নাম মুন্নিদেবী নইখে ----।"

রাস্তায় পা ঠুকে ঠুকে হুঙ্কার দিচ্ছে মুন্নিদেবী। হাত পা ছুঁড়ে শাসাচ্ছে কোন অদৃশ্য অরাতিকে।

আমরা জোরে পা চালিয়ে দিলাম। ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এলো তার শাসানি। খানিক পরে আর কিছু শোনা গেল না।

মসিমা ছোটার গতি কমিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, মুন্নিদেবী ওরকম করছে কেন? সুরতিয়াই বা আমাদের পালাতে বললো কেন?"

আমরা তিনজনে সুরতিয়ার পানে চাইলাম। সুরতিয়া নিশ্চুপ।

মাসিমা চেপে ধরলেন, "তুই নিশ্চয়ই জানিস। বল কি ব্যাপার ----।"

ততক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছি আমরা। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে খাটের উপর ধপাস করে বসে পড়লেন মাসিমা।

সুরতিয়া মাটিতে উবু হয়ে বসে খানিক ইতস্তত করে বললো, "উ বউরাহা ভো গইল মাইজি (ও পাগল হয়ে গেছে)।"

মাসিমা গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা বললেই হল! মুন্নিদেবীর মত অমন আঁটসাঁট গোছালো মানুষ হঠাৎ বউরাহা হয়ে গেল রাতারাতি?"

এরপর সুরতিয়া আদ্যোপান্ত ভেঙে বললো সমস্ত ইতিকথা।

সেই যে একটা জোয়ান-বয়সী মেয়েকে চন্দুলালের চায়ের দোকানের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেছিল কেউ, সেই তাকে নিয়েই যত গোল। মেয়েটি কে বা কোথাকার সে খবর কেউ জানে না, তবে খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছে তার চেহারা হাবভাব ও অবস্থা দেখে। ওর সর্বনাশটা যে কার হাতে হয়েছে তাও জানা নেই কারো। মেয়েটা লোক চক্ষু থেকে যথাসাধ্য আড়ালে রাখতো নিজেকে। নেহাত খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পারলে এগিয়ে আসতো খাবারের খোঁজে। ইদানীং চন্দুলালই দু'বেলা খাবার সরবরাহ করতো তাকে, স্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টি বাঁচিয়ে। এঁটোকাঁটা নয়, নিজের দোকানে বানানো ভাল ভাল খাবারই দিতো তাকে। চন্দুলালের ভারি মায়া পড়ে গেছিল মেয়েটার উপর।

মুন্নিদেবী জানতো না চন্দুলালের জীবনের গোপনতম কামনা একটি সন্তানের, যার বিহনে সমস্ত বিশ্বসংসার চন্দুলালের কাছে খাঁ খাঁ মরুভূমি হয়ে উঠেছিল ক্রমে। একদিকে সন্তান ছাড়া তার জীবন অর্থহীন

অন্যদিকে সেই সন্তানের কারণেই আর একজনের সবকিছু ধুলিসাৎ হয়ে গেছে - বিধাতার এই পরিহাস বড় অসহ্য, বড় নির্মম মনে হয়েছে চন্দুলালের। প্রথমে হয়তো মেয়েটিকে বাঁচাতেই শুধু চেয়েছিল সে। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেও নতুন করে, পূর্ণরূপে বাঁচার সুযোগ পেয়ে গেল হঠাৎ। ঘর থেকে বউয়ের সিঁদুরের কৌটো বার করে এনে তার থেকে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল নিরাশ্রয় মেয়েটির সিঁথিতে।

মুন্নিদেবী এ খবর শুনে চেলাকাঠ নিয়ে ছুটে গেছিল কলঙ্কিনীর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়ে তার বউ হবার সাধ চিরকালের জন্যে ঘুচিয়ে দিতে। কিন্তু চন্দুলাল, যে নাকি কোন দিন মুন্নিদেবীর মুখের উপর কথা বলার সাহস করেনি আগে, সব ব্যাপারে তারই মতানুসারে চলে এসেছে এ যাবৎ, বুক উঁচিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটিকে আড়াল করে। মুন্নিদেবীর হাত মুচড়ে চেলাকাঠ কেড়ে নিয়ে বলেছিল যে এখন থেকে এ মেয়েটি তার বিয়ে করা বউ। তার গায়ে আঁচড়টুকু লাগতে দেবে না সে। মুন্নিদেবীর চিৎকার - হাহাকার - বিলাপ - অভিসম্পাত, চেনা পরিজন আত্মীয় বন্ধুদের সলাপরামর্শ সদুপদেশ কোন কিছুই টলাতে পারেনি চন্দুলালকে। শান্ত গলায় একই কথা সবাইকে বলেছে চন্দুলাল। মেয়েটিকে সে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে। মেয়েটির সকল ভার এখন থেকে তারই। তার গর্ভে এরপর চন্দুলালের সন্তান যারা আসবে তাদেরই মত গর্ভস্থ অজ্ঞাতকুলশীল সন্তানটির পিতৃত্বও অকাতরে স্বীকার করবে সে।

এরপর আর কেউ কিছু বলেনি তাকে। বরং পাঁচজনে মুন্নিদেবীকেই বুঝিয়েছে। তার স্বামী তো আর তাকে ফেলে দিচ্ছে না। আজন্ম ভাতকাপড়ের দাবী তার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। স্বামী হিসেবে চন্দুলাল মুন্নিদেবীর ভরণ পোষণ করতে বাধ্য। সে যদি সেই কর্তব্য পালন না করে সমাজ তাকে ছেড়ে দেবে না।

সুরতিয়া বলে চললো, "এমন বোকা মেয়েমানুষ মাইজি, কোথায় অনিবার্য অবস্থাটা মেনে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করবে তা নয় সমানে ঝগড়া গালাগালি শাপ-শাপান্ত করে চলেছে ক'দিন ধরে। আর এখন তো ক্ষ্যাপা বউরাহা হয়ে গেছে একেবারে।"

"তাই বুঝি চন্দুলাল দোকান পাট তুলে দিয়ে নতুন বউ নিয়ে ভেগেছে?"

সুরতিয়া মাথা নেড়ে বললো, "না মাইজি, চন্দুলাল সে রকম নয়। ভারী কর্তব্যপরায়ণ মানুষ সে। তাছাড়া মুন্নিদেবীর হম্বি-তম্বিকে এখন আর থোড়াই তোয়াক্কা করে চন্দুলাল। আসলে ওর নতুন বউয়ের ছেলে হয়েছে কাল রাতে। ওই ওবাড়ির ছোঁড়াটাকে এইমাত্র রাস্তায় জিজ্ঞেস করলাম। কাল বিকেলে বউকে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছে। বউকে নিয়ে এখন ওখানেই আছে। মুন্নিদেবীরই দোষ। মেয়েমানুষের অত বাড় ভাল নয় মাইজি। ভগবান আর কত সহ্য করবেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তাই।"

সুরতিয়া চলে গেল। আমরাও সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। শরীরের উপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছিল। শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। দেয়াল ঘড়িতে ন'টা বাজে প্রায়। ছুটির দিন। কোনও তাড়া ছিল না। বিছানার উপর উঠে বসে আড়ামোড়া ভাঙছি এমন সময় মাসিমা এসে ঘরে ঢুকলেন। এই এক রাতে চেহারায় বেশ পরিবর্তন হয়েছে। চোখ দুটো ফোলা ফোলা, লাল। মুখ থমথমে।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, "জ্বর-টর হয়নি তো মাসিমা? মুখখানা কেমন ভারি ভারি দেখাচ্ছে।"

মাসিমা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন, "তা হলে তো বাঁচতুম। অসুখ বিসুখ করে টুক করে মরে গিয়ে জ্বালা জুড়োবো সে কপাল কি আর করেছি মা!"

চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

অবাক হয়ে বললাম, "কি হয়েছে মাসিমা? কাঁদছো কেন?"

মাসিমা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে বললেন, "ওই এক হতভাগী মেয়ে গর্ভে ধরেছিলুম। কি নাচনই যে নাচাচ্ছে মা। সারা জীবন ধরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলো। অত ভাল হস্টেলে দিলুম কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে, যে মেয়ে আমার লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। তা না মেয়ে গোঁ ধরলেন তেনার আর লেখাপড়া চাই না, বিয়ে চাই। কত বোঝানো, কত সাধ্য সাধনা, কিছুতেই কিছু না। শেষ অবধি হার মেনে বললুম ঠিক আছে। তোমার যদি গোমুখ্যু হয়ে জীবন কাটাতে সাধ তবে তাই সই। তোমার বিয়েই দিয়ে দেবো এবার। এত কাঠ খড় পুড়িয়ে, দেবীমাতার মানৎ মেনে এমন ভাল সম্বন্ধ ঠিক হল এখন হঠাৎ নতুন রা তুলছে ও

নাকি আর বিয়ে টিয়ে করবে না। লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করবে। স্বাধীন, স্বাবলম্বী হবে। এখন আমি কোথায় যাই বল দিকি? তোর মেসোমশায়কে চিঠি লিখে দিয়েছি বিয়ের দিনক্ষণ জানিয়ে, সে মানুষ এতক্ষণে হয়তো অর্ধেক জিনিসের অর্ডার দিয়ে বসে আছে, সারা শহরময় রাষ্ট্র করে দিয়েছে খবরটা। এখন হুট করে বিয়ে বন্ধ করলে লোকে বলবে কি? পাত্র পক্ষকেই বা কি জবাবদিহি করবো?"

সাহানা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো। তারও দু'চোখ লাল এবং ফোলা ফোলা। মাসিমা তার পানে না তাকিয়ে মুখে চোখে পরম বিতৃষ্ণার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে দুম দাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।